শিবনগরের শিবমন্দির

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রবীর আচার্য

বর্ধমান জেলার অগ্রদ্বীপ স্টেশনের পূর্বদিকে শিবনগর একটি অখ্যাত ছোট্ট গ্রাম। গ্রামটির দক্ষিণে কাঁঠালবেড়িয়া, উত্তরে আয়মাপাড়া এবং পূর্বে শিমূলডাঙ্গা নামে আরও তিনটি ছোটো ছোটো গ্রাম আছে। অগ্রদ্বীপ স্টেশন ও শিবনগরের মাঝ দিয়ে শঙ্খবাহিনী বা সাইনি নামে একটি ক্ষীণ জলধারা গঙ্গাধারা গিয়ে মিশেছে। বর্ষায় একটি ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। এই সাইনি নদীর ধারে পূর্বস্থলী থানার অন্তর্গত পিলা অঞ্চলের বহড়া মৌজায় শিবনগর গ্রামটি অবস্থিত। গ্রামের মাঝ বরাবর একটি পাকা রাস্তা রক্ষীবিহীন রেলগেটকে অতিক্রম করে উত্তরদিকে গেছে। ওই পাকা রাস্তার পশ্চিমে এবং রেললাইনের উত্তরে একটি মনোরম আমবাগান। আর আমবাগানের মধ্যেই অবস্থিত শিবনগরের দ্বাদশ শিবমন্দির।

গঙ্গা থেকে প্রায় সওয়া এক কিমি দক্ষিণে শিবনগর গ্রাম মূলত অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের বাস। এছাড়া একঘর ঘোষ ও শিবমন্দিরের পূজারি একঘর ব্রাহ্মণ বাস করেন। অধিবাসীরা অধিকাংশ কৃষিমজুর ও মৎস্যজীবী। গ্রামে মুসলিম নেই, কোনও কুটির শিল্পও নেই। পার্শ্ববর্তী গ্রাম বহড়া ও কাঁঠলবেড়িয়াকে নিয়ে ভোটের বুথ হয় একটি। ২০০১ এর জনগণনা অনুযায়ী বহড়া এবং শিবনগর মিলিয়ে মোট জনসংখ্যা ২২০২ জন। তার মধ্যে ১৩৫২ জন তপশীলী সম্প্রদায়ভুক্ত। গৃহসংখ্যা ৪৫৪টি। বহড়াতে একটি প্রাথমিক বিদ্যলায় আছে। পাশে নতুনগ্রামে সিজনির বাবুদের বাগানবাড়িতে প্রজ্ঞাদাস কঠিয়া বাবা ১৭/১৮ বছর আগে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেখানে জুনিয়ার হাইস্কুল, পাঠাগার, স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্র, বন্যা ও দুর্যোগ ত্রাণ ব্যবস্থা আছে। উচ্চ বিদ্যালয় রয়েছে অগ্রদ্বীপে।

গ্রামের লৌকিক উৎসব বলতে গোটা ছয়েক মনসাপূজা তার মধ্যে দুটি বারোয়ারি। এছাড়া দু-একটি সরস্বতী প্রতিমা পূজা হয়। মনসা পূজা না থাকলেও ঝাঁপান গান হয়। কিন্তু শিবমন্দির থাকা সত্ত্বেও বোলান গান ও গাজন হয় না। তবে নীলপূজা হয়। গ্রামে একটি কালীপূজা হলেও দুর্গাপূজা নেই। সারা গ্রাম খুঁজে কোনও প্রাচীন পাথুরে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেল না। এমনকী শিবমন্দিরের নিকট বড়ো বট গাছতলার পুরানো ষষ্ঠীতলাতেও নয়। গ্রামে কোনও সাংস্কৃতিক চর্চা নেই। তবে নিকটস্থ কাঠিয়া বাবার আশ্রমে শ্রাবণ মাসে গুরু পূর্ণিমায় বাৎসরিক উৎসব হয়। সমারোহ করে নরনারায়ণ সেবা হয়। তাছাড়া জন্মাষ্টমী ও দোল হয়।

শিবরাত্রিতে দ্বাদশ শিবমন্দিরের সামনে বসে চার দিন ধরে মেলা। পূর্বে এই মেলায় জুয়া, লেটো গান ইত্যাদি হত। কিন্তু বর্তমানে কাঠিয়া বাবার ব্যবস্থাপনায় মেলা কমিটি তৈরি হয়েছে, সম্পাদক শ্রী বিশ্বনাথ বিশ্বাস। এই মেলা উপলক্ষ্যে নাটক, আবৃত্তি, গান, নাচ, বাউল ইত্যাদি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। মেলা কমিটির সঙ্গে মন্দিরের কোনও সম্পর্ক নেই। আর পাঁচটা গ্রাম্য মেলার মতো এই মেলাতেও শিবনগরের আমবাগান কলমুখর হয়ে ওঠে।

পূর্বে এই জায়গাটি জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। ছিল খরগোস, সাপ, বেজি, শিয়াল জাতীয় বন্য প্রাণীদের আস্তানা, কাটোয়া থানার চান্ডুলি গ্রামে মিত্র বংশীয় জমিদারগণ প্রায় দেড়শো বছর আগে এখানে দ্বাদশ শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করান। তাঁরা মন্দির নির্মাণকল্পে কিছু মজুর এখানে এনেছিলেন। ক্রমে তাঁরাই ক্ষুদ্র বসতিটি গড়ে তোলেন। দ্বাদশ শিবমন্দিরের জন্যই গ্রামটির নাম হয়ে যায় শিবনগর। মিত্র বংশীয় জমিদারদের একটি কাছারি বাড়ি এখনও শিবনগরে আছে। তবে অগ্রদ্বীপের ঘোষেরা সেটি কিনে বসতবাটি করেছেন। ওই জমিদারদের বংশধর রাসবিহারী ও বিজনবিহারী মিত্র এখনও কলকাতা থেকে মেলার সময় কয়েকশো টাকা পাঠান পূজার খরচ বাবদ।

দ্বাদশ শিবমন্দিরে একবেলা নিত্যসেবা হয়। পূজারি শ্রী বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য। বিশ্বনাথবাবুর শাশুড়ির পিতা সত্যকিঙ্কর ভট্টাচার্য পূর্বে নিত্যসেবা করতেন। সেকারণে তিনি জমিদারদের দেওয়া ১০/১২ বিঘা নিষ্কর জমি ভোগ করতেন। কিন্তু কন্যার বিবাহ দেওয়ার সময় সে জমি বিক্রি করে ফেলেন। পরবর্তী কালে বহড়া মৌজায় দেড় বিঘা জমি ও বসতবাটির জায়গা জমিদারগণ আবার বিশ্বনাথ বাবুকে দেন।

বহড়া মৌজায় অবস্থিত দ্বাদশ শিবমন্দিরের দাগ নং ৬১০। মন্দিরের সামনে অর্থাৎ উত্তরে ৭/৮ বিঘা আমবাগান এবং বাগানের পশ্চিমে সাত আট বিঘা জলকরের একটি দিঘি, নাম শিবসাগর। এই সবই বর্তমানে সরকারি কাস জমি, এক নম্বর খতিয়ানের অন্তর্ভুক্ত। দিঘিটিতে একটি বাঁধা ঘাট আছে এবং লিজ প্রথায় মাছ-চাষ হয়। সবই জনসাধারণের ব্যবহার্য।

মাঝখানে একটি বড় উঠোনকে ঘিরে তিন দিক দিয়ে মোট তেরোটি মন্দির। উঠোনের পূর্বে পাঁচটি, পশ্চিমে পাঁচটি এবং দক্ষিণে তিনটি। পূর্ব ও পশ্চিম দিকের মাঝের মন্দির দুটি পঞ্চরত্ন অর্থাৎ পাঁচ চূড়া বিশিষ্ট এবং অপেক্ষাকৃত বড়ো বাকিগুলি একচূড়া সাধারণ বাংলা ধাঁচের মন্দির। উচ্চতা প্রায় কুড়ি ফুট মতো। সব মন্দিরগুলিই গায়ে গায়ে লাগালাগি। সামনে অপ্রশস্ত উঁচু চাতাল দিয়ে জোড়া। পশ্চিম দিকের সারির প্রথমটি ছাড়া বাকি বারোটিতে শিবলিঙ্গ

বর্তমান। গৌরীপট্ট সহ লিঙ্গগুলির উচ্চতা দু ফুট করে, ব্যাস নয় ইঞ্চি মতো। প্রতিটিতে পুরানো কাঠের দরজা। মন্দিরগুলিতে কোনও টেরাকোটা বা পঙ্খের কাজ নেই। সব মন্দিরগুলি কাঠে পোড়ানো পাতলা ইঁটে তৈরি। আনুমানিক প্রায় দেড়শো বছর আগে তৈরি। মন্দিরের গায়ে কোনও প্রতিষ্ঠা লিপি নেই। ফলে প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠা কাল জানা যায় না। সামনের দিকটি নিচু পাঁচিলঘেরা। তার দুদিকে দুটি গ্রিলের তৈরি ছোটো ফটক। দুটি ফটকের মাঝে একটি দক্ষিণমুখি মন্দির সাম্প্রতিক কালো নির্মিত। তার তিন দিকে বারান্দা কিন্তু সেখানে কোনও দেবদেবী নেই। আমবাগান ঘেরা এই দ্বাদশ শিবমন্দিরের জন্যই শিবনগর গ্রামটি আশপাশের গ্রামগুলির চেয়ে বিশেষত্ব লাভ করেছে।

তবে শিবনগরের প্রায় এক কিলোমিটার দক্ষিণে বহড়া গ্রামে আরও একটি উল্লেখযোগ্য অষ্টকোণ শিবমন্দির রয়েছে। মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাতা বাংলা তথা দেশীয় সংবাদপত্রের জনক গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। পরবর্তী প্রবন্ধে সেটি আলোচ্য।

শিবনগরে যদিও কোনও কুটিরশিল্প নেই কিন্তু অগ্রদ্বীপ স্টেশনের দক্ষিণে বেশ কিছু কাষ্ঠশিল্পীর আস্তানা রয়েছে। এঁরা আদতে পার্শ্ববর্তী নতুনগ্রামের আদি বাসিন্দা এবং বংশানুক্রমে কাষ্ঠশিল্পী। জনৈক হরিপদ রায়চৌধুরী বদান্যতায় এখানকার কাষ্ঠশিল্পের চরম উৎকর্ষ লাভ হয়েছে। তিনিই নতুনগ্রামের অধীর ভাস্করকে কলকাতা নিয়ে গিয়ে প্রথামাফিক শিল্পকারিগরি বিদ্যা শেখার বন্দোবস্ত করে দেন, সঙ্গে সরকারি সাহায্যেরও। পরবর্তীকালে অধীর ভাস্করের কাছে তালিম নিয়ে তাঁর পুত্র গোপাল সহ অন্যান্য শিল্পীরা আপন আপন প্রতিভায় বিকশিত হতে থাকেন। ফলে এই গ্রামের শম্ভুনাথ ভাস্কর কাষ্ঠশিল্পে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পান। তাঁর ভাইপো ভক্ত ভাস্কর রবিপাল চৌধুরীর সহযোগিতায় আমেরিকায় শিল্প প্রদর্শনের আমন্ত্রণ পেয়ে সেখানে গেছিলেন। এছাড়াও এখানকার শিল্পীরা কলকাতার সরকারি শিল্প মেলায় সাম্মানিক সহ আমন্ত্রণ পেয়ে থাকেন। সরকারি সাহায্যও পান।

উল্লেখযোগ্য শিল্পীরা হলেন ভাস্কর পদবীযুক্ত জগবন্ধু, কৃপাসিন্ধু, ভবসিন্ধু, পরিতোষ, জীবানন্দ, অক্ষয়, তপন, শ্রীকান্ত প্রমুখ। সূত্রধর পদবীযুক্ত দোলগোবিন্দ, নবকুমার, সঞ্জয়, সুজয়, সোমনাথ, রতন, রণজিৎ, প্রাণকৃষ্ণ, ক্ষুদিরাম প্রমুখ। এঁরা বিভিন্ন দেবদেবী, জন্তু জানোয়ার, মনীষীর মূর্তি, সৌখিন শিল্পকলা প্রভৃতি কাঠের উপর খোদাই করেন। শিল্প শৈলীতেও যথেষ্ট নূতনত্ব আছে। গৃহসজ্জা ও আসবাব হিসেবে এগুলি ব্যবহৃত হয়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :
ড. কালীচরণ দাস, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, প্রাণকৃষ্ণ সূত্রধর।